অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 170-175
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.024

RABINDRANATH THAKURER 'NASTANIR' : NIR NASTER GALPO / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়’ : নীড় নষ্টের গল্প

DR. MOUSUMI PAUL / ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপক, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email: mousumipal1971@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
মানবমনস্তত্ত্ব, জীবনসমস্যা, অন্তর্লোক, নীড়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনপিপাসা, অন্তর্বেদনা

Abstract:
‘নষ্টনীড়’ গল্পটি থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন দৃষ্টির সূচনা। আমাদের পরিচিত মানবমানবীর জীবনেই অনেক সময় এমন এক অপ্রত্যাশিত হৃদয়বৃত্তি বিকাশ লাভ করে যা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে যায়। গল্পটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ মানব মনস্তত্ত্বের এই দৃষ্টিতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভূপতির স্ত্রী চারুলতার জীবনে প্রণয় বিস্তারের অপ্রত্যাশিত গতি ‘নষ্টনীড়’ গল্পের মূল উপজীব্য। চারুলতা ও ভূপতির দাম্পত্য সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই রবীন্দ্রনাথ চারুর জীবনের শূন্যতাকে ব্যক্ত করেছেন। ভূপতির উপেক্ষার ফলে চারু তার সমবয়স্ক দেবর অমলের সঙ্গে স্নেহমধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজের শূন্যতাকে ভরে তুলতে চেয়েছে। চারুর নিভৃত মর্মস্থলে অমল যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ভূপতি হয়েছিল চিরনির্বাসিত একথা কিন্তু চারু নিজেও বহুদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই উপলব্ধি প্রথম ঘটলো যেদিন ভূপতি বাইরের জগতে নিঃস্ব হয়ে অন্তরের দিক থেকে একান্তভাবে চারুলতাকে আশ্রয় করতে চাইলো। গল্পের এই স্থানে এসে চারুর জীবনসমস্যা জটিল রূপ ধারণ করল। চারু আবিষ্কার করল তার হৃদয়ের দ্বার ভূপতির কাছে চিররুদ্ধ। অন্যদিকে চারু যখন প্রাণপণ শক্তিতে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছে তখন ভূপতি অনুভব করেছে চারুর অন্তর্লোকে তার কোন ঠাঁই নেই। চারু ও ভূপতি দুজনেই মনের দিক থেকে কোনদিনও এগিয়ে আসতে পারেনি পরস্পরের কাছে। ফলে তাদের নীড় সম্পূর্ণভাবে তৈরি হবার পূর্বেই ভেঙ্গে গেছে।

Discussion:

১৩০৮ বঙ্গাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়’ গল্পটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। গল্পটিতে ভূপতি-চারুলতার নীড়ভঙ্গের কাহিনী নানা ঘটনায় পল্লবিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ‘নষ্টনীড়’ গল্পের কাহিনী, এর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, চরিত্রের উপস্থাপনা, কাহিনীর বিন্যাস, রচনার সৌন্দর্য সব মিলিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, ‘নষ্টনীড়’ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা। ‘নষ্টনীড়’ গল্পটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ মানব মনস্তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভূপতির স্ত্রী চারুলতার জীবনে প্রণয় বিস্তারের অপ্রাপ্তি ‘নষ্টনীড়’ গল্পের মূল উপজীব্য। চারুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – “ধনী গৃহে চারুলতার কোন কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোন অভাব ছিল না।” [১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চারুর জীবনে কোন অভাব না থাকার মধ্যেও তার অবচেতন মনের রিক্ততার আভাস দিয়েছেন। চারুলতা তার জীবনের এই শূন্যতাকে দূর করার জন্য তার সমবয়স্ক দেবর অমলের সঙ্গে নানাপ্রকার স্নেহ-মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজের শূন্যতাকে ভরে তুলতে চেয়েছে। ভূপতির উপেক্ষার অন্তরালে অমলকে কেন্দ্র করে চারুর জীবনপিপাসা যেভাবে মুক্তি খুঁজেছে, তার মধ্য দিয়েই ‘নষ্টনীড়’ গল্পের সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার শুরু। চারুর নিভৃত মর্মস্থলে অমল যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ভূপতি নির্বাসিত হয়েছিল, একথা চারু নিজেও বহুদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই উপলব্ধি প্রথম ঘটলো যেদিন ভূপতি বাইরের জগতে নিঃস্ব হয়ে অন্তরের দিক থেকে একান্তভাবে চারুলতাকে আশ্রয় করতে চাইল। ফলে চারুর জীবন-সমস্যা জটিল হয়ে পড়ল। গল্পকার লিখেছেন – “ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।” [২]

ভূপতি যখন চারুর কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকু পরিপূর্ণভাবে আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, তখন চারুর বিরহতপ্ত হৃদয় অমলের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত। অমলের বিদেশ যাত্রায় চারুর অন্তর ক্রমশ অসীম শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গল্পটিতে ভূপতির অন্তরের যে বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তা চারুর বেদনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গল্পে ভূপতির ভাবনা–“আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে”![৩] মানবচরিত্রের এমন বিচিত্র রূপ রবীন্দ্রসাহিত্যে ‘নষ্টনীড়’ গল্পের পূর্বে এত স্পষ্ট করে কোথাও ব্যক্ত হয়নি। গল্পে ভূপতি-চারুলতার নীড় ভাঙ্গার কাহিনী নানা ঘটনার মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে সম্পর্কের বাধানিষেধ লঙ্ঘন করে যে প্রেম চারুর জীবনে এসেছে রবীন্দ্রনাথ তার কোন পরিণতি দেখাননি। উপসংহারে চারু আর ভূপতির তীব্র মর্মদাহ ছাড়া আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোন সমাধানের চেষ্টা করেননি। শুধু মানুষের অন্তরে যে অগ্নিদাহন তিলে তিলে তাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তারই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন আলোচ্য গল্পে। চারুর নারীসত্তার যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাকে সামাজিক আদর্শ, সংস্কার বা বিবেকবুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা চলে না। এ হচ্ছে নারীর মনের এমন এক গোপন গভীর জটিল পথ যার কোন আদিঅন্ত নেই। সেই সীমাহীন পথে দাঁড়িয়ে চারুর প্রেম অতৃপ্ত, অপরিণত। সমাধানহীন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তার জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যে প্রেম সমাজে স্বীকৃতি পাবে না সেই পথেই চারুর নারীত্বের অভিসার। যার পরিণামে বিপুল বেদনা ছাড়া আর কিছুই নেই। এদিক দিয়ে এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন সমস্যা নিয়ে সচেতন

হয়েছে বলা যায়। চারুলতাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র গল্প প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে। ভূপতির সঙ্গে চারুর বিয়ে হবার পর সুমধুর সম্পর্কে তাদের দাম্পত্য অতিবাহিত হয়ে চলছিল। সংসারে তার করণীয় কিছুই ছিল না। ভূপতির অর্থের প্রাচুর্য ছিল। ফলে ঘরে দাসদাসীর অভাব ছিল না। এই কারণেই পত্রিকার কাজে উমাপদ যোগ দেওয়ার পরেই চারুর সঙ্গিনী হিসেবে মন্দাকিনীকে ভূপতির বাড়িতে আশ্রয় দিতে হল। বুদ্ধিবিদ্যায় মন্দাকিনী চারুর সমধর্মী না হলেও আলস্য শিথিল মুহূর্তের সঙ্গী হিসেবে সময় কাটানোর পক্ষে উপযোগী ছিল। ভূপতি পত্রিকা, রাজনৈতিক আলোচনা ও ক্রিয়া-কলাপে ব্যস্ত থাকায় স্বামী-স্ত্রীর যৌবনের প্রথম প্রেমোন্মেষ কাল অবচেতন অবস্থায় কেটে গিয়েছিল। তবে চারু পাঠাভ্যাসের জগতকে বেছে নিয়েছিল। ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল ভূপতির বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তো। চারুর পড়ার সঙ্গী ছিল সেই অমল। এই পড়াশুনার সূত্রে উভয়ে কাছাকাছি আসে। অমলের নৈকট্যে চারুর রুদ্ধ মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। সাহিত্যকে সে ভালোবেসেছিল। অমল তার সাহিত্যপ্রীতির দীক্ষাগুরু। চারুর অনুরোধেই অমলের লেখনীধারণ, প্রতিপত্তি এবং সেই সূত্রেই চারুর সাহিত্য জগতে প্রবেশ। চারুর অবসরময় জীবনে ক্লান্তির উপশম হয়েছিল অমলের সান্নিধ্যে ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণে।

অমল যেন চারুর আবিষ্কার। অমলের উপর তার একার অধিকার। এখানে অন্য কারোর প্রবেশের অধিকার নেই। মন্দাকিনী অমলের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় কাঁটা বিঁধলো চারুর মনে। চারুর ছেলেমানুষী লেখার পর্ব পাঠক সমাজের কাছে চলে আসা চারুর পছন্দ হয়নি। তাদের স্বপ্ন ও কল্পনায় তৈরি জগত সম্পূর্ণ তাদের। এর বাইরে আর কিছু চায়নি চারু। চারু আর অমলের সম্পর্ক নিয়ে সমালোচকের বক্তব্য – "বাহ্যত তাদের সম্পর্ক বৌদি দেওরের। গল্পটি পড়তে পড়তে কিন্তু এই সম্পর্কের কথা মনে থাকে না। বরং পাঠক দেখতে পায় কীভাবে তারা দু'জনে একটু একটু করে নিভৃত সুন্দর একটা জগৎ গড়ে তুলেছে।" [৪] কিন্তু অমল চলে যাওয়ার পর চারু দেখল সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অমলের স্মৃতি। আর এই স্মৃতিকে সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছে। ফলে ভূপতির সঙ্গে তৈরি নীড় তাকে ভেঙ্গে দিতে হয়। আসলে এই নীড়কে অক্ষত রাখার চেষ্টাও চারু করেনি। ফলে নীড় ভেঙ্গে যায়। অমল চলে যাবার পর ভূপতি যখন তার সান্নিধ্য কামনা করছে তখনই অমলের স্মৃতির কবর থেকে উঠে আসা উচিত ছিল চারুর। তাতে তার নতুন করে নীড় গড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু চারু তা করেনি বা করতে পারেনি। ফলে চারুও অবলম্বনহীন হয়ে পড়ল। গল্পকার এভাবেই চারুর একাকীত্ব ও অসহায়তার চিত্র এঁকেছেন 'নষ্টনীড়' গল্পে। ভূপতি খবরের কাগজের সম্পাদক সূত্রে যথেষ্ট সম্পত্তি ও অর্থের মালিক হলেও খবরের কাগজ বের করার জন্য সময় ব্যয় করা ছিল তার শখ। খবরের কাগজের সম্পাদক ভূপতি "যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না।" [৫] ভূপতির কাজের প্রয়োজন ছিল না, শুধু নেশা চরিতার্থ করার জন্যই ভূপতি খবরের কাগজের সম্পাদনা করত। ফলে অন্তরে তার বালিকা বধূ কখন যৌবনে পৌঁছে গেছে এই সংবাদটি তার কাছে ছিল তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –"ভূপতি সংবাদপত্র সম্পাদনায় ব্যস্ত নিরবসর কাজের লোক। স্ত্রীর দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না। স্ত্রীর ভালোবাসা যে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়, এ কথা তাহার মনে কখনো জাগে নাই।" [৬]

ভূপতি একথা উপলব্ধি করতে পারেনি যে শত ঐশ্বর্য পদমূলে ঢেলে দিলেও নারীর হৃদয় লাভ করা যায় না। আবার কোন আয়াশ ছাড়াই একটি নারীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে। ভূপতি হয়তো কবিতা বোঝে না, বোঝে মানুষকে। কিন্তু এত কাছে থেকেও ভূপতি উমাপদর মত কৃতঘ্ন মানুষের চরিত্রকে বুঝতে পারেনি। ভূপতির

মনোলোক অকৃত্রিমতা, সারল্য ও বিশ্বাস দিয়ে গঠিত ছিল। তাই তাকে বুঝতে তার যেমন সময় লেগেছে, তেমনি চারুর কাছে যখন তিনি ফিরে এসেছেন তখন সে নিজেই বুঝতে পেরেছে যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। ভূপতি নিজে তার স্ত্রী চারুকে সময় দিতে পারেনি বলে সে মন্দাকিনীকে চারুর সঙ্গিনী হিসেবে নিয়ে এসেছে। অমলকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলে অমল ও চারুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে ভূপতির চেতনা হয়েছে যে তার সমস্ত সিদ্ধান্তই ছিল ভুল। ফলে অপরিসীম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তার জীবন। অথচ তার মধ্যে সততা ও বিশ্বাসের কোন ঘাটতি ছিল না। ভূপতির অন্তর্বিশ্লেষণের চিত্র গল্পে উপস্থাপিত। ভূপতির মনের অবস্থা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তার ভাবনার মাধ্যমে –"আমি কোথায় পালাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গ দান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব।" [৭] চারু যখন প্রাণপণ শক্তিতে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছে তখন ভূপতি অনুভব করেছে –"তাহার জন্য চারুর এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা, ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে।" [৮]

গল্পের শেষে দেখা যায় প্রতারিত সর্বস্বান্ত ভূপতি ফিরে এসেছে তার ঘরে। যে ঘর স্বেচ্ছায় সে ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারল যে সেই ঘরে তার আর স্থান নেই। শুধু ঘরেই নয় অসহায় ভূপতির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চারুর অন্তর্লোকেও তার কোন ঠাঁই নেই। সেখানে শুধু অমলের স্মৃতি নিরন্তর জেগে আছে। তাই সে মনে মনে বলে – "হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই।" [৯] ভূপতির অন্তর মথিত করে উৎসারিত এই বিপুল বেদনা তার অন্তর্লোককেই উন্মুক্ত করে। বিদেশে একটি পত্রিকার সম্পাদকের কাজ পেয়ে ভূপতি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে চারু তার সঙ্গিনী হতে চায়। কিন্তু অন্যাসক্তা চারুর এই আবেদন ভূপতি প্রথমে অগ্রাহ্য করেছে। কারণ ভূপতির মনে হয়েছে – "যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার ভাঙ্গা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?" [১০] ভূপতি নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। এর জন্য ব্যস্ততার কারণে তিনি সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা স্ত্রীর দিকে বেশি নজর দিতে পারেননি। অথচ লেখাপড়া বা সাহিত্যচর্চার প্রতি স্ত্রী চারুর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল তাও তিনি জানতেন। তাই তার আধুনিক সংস্কৃতিসম্পন্ন ভাই অমলকে চারুর বিদ্যাচর্চার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভূপতি তার পত্রিকার মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি অমলকে পত্নীর বিদ্যাচর্চার দায়িত্ব দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। স্বামীর বিশ্বাসের জগত, ভাবনার জগত থেকে অমলের সাহিত্য-সংস্কৃতিময় আধুনিক জীবনের আশ্বাসে চারুর মন ভরে উঠেছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অমলের নির্মল ছেলেমানুষী ভরা মনের সান্নিধ্য চারুকে আকুল করে তুলেছিল। অমলের মধ্যে চারু আবিষ্কার করেছিল এমন এক পুরুষকে যার জন্য তার অন্তরের অন্তরতম কোণে আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ যার সন্ধান সে নিজেই জানতো না। একটু একটু করে তার নিকট সান্নিধ্যে আসার পর নিজের আকাঙ্ক্ষার ভুবনটির সন্ধান সে পেয়েছিল। সাহিত্যের সঙ্গী অমলের প্রতি চারুর কৃতজ্ঞতা ছিল। কৃতজ্ঞতা থেকে ভালোলাগা, ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার সৃষ্টি হল। একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করলেও দুজনের মনের গতি ছিল ভিন্ন। একই সঙ্গে সাহিত্যপ্রেম ও ব্যক্তিপ্রেম বিভোর হয়ে উঠলো। আর এখান থেকেই ভূপতির সঙ্গে তার দূরত্ব সূচিত হলো।

ভূপতির সঙ্গে কথাবার্তা বা কর্তব্যে চারুর কোন অবহেলা ছিল না। কিন্তু নারীর মন চিরকালই তার আয়ত্তের

বাইরে। তাই তার মন কখন অমলময় হয়ে উঠেছিল তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ভূপতির পত্রিকায় নিয়ে উন্মাদনা, তারপর উমাপদর কৃতঘ্নতা – এসবে সে নিজের চারদিকে দেয়াল তুলেছিল। উমাপদর কীর্তিতে তার আর্থিক কষ্টই শুধু হয়নি তার চেয়ে বড় বেদনা সে পেয়েছিল বিশ্বাসভঙ্গের। সংকটকালে চারুর সান্নিধ্য তার প্রয়োজন ছিল। যা সে পায়নি। অন্যদিকে ভূপতিও তেমন করে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি চারুর কাছে। গল্পে - "আত্মরক্ষার্থে অমল পালিয়েছে আর নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠুর ভয়াল পরিণামের শিকার হয়েছে ভূপতি ও চারুলতা।" [১১]

অমল বিয়ে করে বিদেশে চলে যাবার পর ভূপতি চারুর আশ্রয়ে ফিরে আসতে চাইলো। চারুকে সময় দেওয়া সে নিজের কর্তব্য মনে করল। কিন্তু চারুর হৃদয়ে তখন অমলের অবস্থান। ভূপতিকে দেওয়ার কিছু তার ছিল না। চারুর উদাসীনতায় ভূপতি তার নীড় ভাঙ্গার প্রমাণ পেল। সমালোচক বলেছেন - "কিন্তু একদিন ভূপতি জানিল, সমস্ত বুদ্ধি ও চৈতন্য দিয়া বুঝিল, তাহার নীড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগিবে না। সংসার একেবারে তাহার কাছে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।" [১২] তাই মহীশূরের খবরের কাগজে সম্পাদনার ডাক পেয়ে তিনি আর দেরি করলেন না। চারুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে প্রথমে অস্বীকৃত হলেও পরে চারুর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি চারুকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন। এবার চারু রাজি হলো না। যে স্বামী তাকে গ্রহণে অনিচ্ছুক, তার সঙ্গ সে আর চাইছে না। ফলে চারু আর ভূপতির নীড় নষ্ট হয়ে গেল। সমালোচক বলেছেন – "এই নীড় নষ্ট হওয়ার মধ্যে যে ট্র্যাজেডি নিহিত আছে, তা নির্মম ও মর্মান্তিক এক পরিণতি।" [১৩]

এই গল্পটি থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন দৃষ্টির সূচনা। এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রচলিত সংস্কার এবং পরিচিত পরিবেশ ও সমাজকে স্বীকার করে নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন। কিন্তু সেই পরিচিত মানবমানবীর জীবনেই অনেক সময় এমন এক অপ্রত্যাশিত হৃদয়বৃত্তি বিকাশ লাভ করে যা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে যায়। তা অপ্রত্যাশিত হলেও অস্বাভাবিক নয়। গল্পটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ মানব মনস্তত্ত্বের এই দৃষ্টিতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভূপতির উপেক্ষার ফলে চারু তার সমবয়স্ক দেবর অমলের সঙ্গে স্নেহমধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজের শূন্যতাকে ভরে তুলতে চেয়েছে। তাদের যৌথ পরিকল্পনায় বাগান করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। এরপরে এসেছে সাহিত্যচর্চা। অমল ও চারুর এই দ্বৈত প্রচেষ্টায় কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তার কাছে অসহনীয় ছিল। তাই মন্দার প্রতি অমলের বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব তার হৃদয়কে দগ্ধ করত। চারু নিজেও এ পর্যন্ত অনুভব করেনি তার হৃদয়দাহের মূল কোথায়। আসলে –"ভূপতির উপেক্ষার অন্তরালে অমলকে কেন্দ্র করে চারুর জীবনপিপাসা যেভাবে মুক্তি খুঁজেছে তার মধ্য দিয়েই 'নষ্টনীড়' গল্পের সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূচনা।"[১৪] চারুর নিভৃত মর্মস্থলে যে অমল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ভূপতি হয়েছিল চিরনির্বাসিত একথা কিন্তু চারু নিজেও বহুদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই উপলব্ধি প্রথম ঘটলো যেদিন ভূপতি বাইরের জগতে নিঃস্ব হয়ে অন্তরের দিক থেকে একান্তভাবে চারুলতাকে আশ্রয় করতে চাইলো। গল্পের এই স্থানে এসে চারুর জীবনসমস্যা জটিল রূপ ধারণ করল। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন - "নষ্টনীড়' গল্পে নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বেদনামুক্তি নেই, ক্যাথারসিস নেই। সর্বনাশা কঠোর নগ্ন সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে ভূপতি "বৃদ্ধ" হয়ে গেছে, আর সর্বতোভাবে পরাভূত বিপর্যস্ত হয়ে চারুলতা নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রণার তুষাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে।"[১৫] চারুর অবচেতন মনে অমলের প্রতি ভালোবাসা যে কতটা গভীর ছিল তার স্বরূপ তার কাছে উন্মোচিত হলো যখন ভূপতি প্রণয়ভিক্ষু হয়ে চারুর সামনে এসে দাঁড়ালো। চারুর রহস্যাচ্ছন্ন অন্তর্লোক তখন এক মুহূর্তে তার নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চারু আবিষ্কার করল তার হৃদয়ের দ্বার ভূপতির কাছে চিররুদ্ধ। অন্যদিকে

চারু যখন প্রাণপণ শক্তিতে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছে ততদিনে চারুর অন্তর্বেদনার কারণ ভূপতির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারু ও ভূপতি দুজনেই মনের দিক থেকে কোনদিনও এগিয়ে আসতে পারেনি পরস্পরের কাছে। ফলে তাদের নীড় সম্পূর্ণভাবে তৈরি হবার পূর্বেই ভেঙ্গে গেছে।

Reference:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'নষ্টনীড়', পৃঃ ৩৮৫।
2. তদেব, পৃঃ ৪১৩-৪১৪।
3. তদেব, পৃঃ ৪২০।
4. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, (সম্পাদনা), 'গল্পচর্চা', পৃঃ ৫১।
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'নষ্টনীড়', পৃঃ ৩৮৫।
6. রায়, নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' পৃঃ ৩৭০।
7. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'নষ্টনীড়', পৃঃ ৪২০।
8. তদেব।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'নষ্টনীড়', পৃঃ ৪২০।
10. তদেব, পৃঃ ৪২০ক।
11. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ৬৯।
12. রায়, নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', পৃঃ ৩৭২।
13. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', 'নষ্টনীড়', কুন্ডু, প্রণয়কুমার, 'নষ্টনীড়: বাংলা গল্পের ধ্রুবতারা', পৃঃ ৫২।
14. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী, 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান', পৃঃ ১৬৯।
15. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', পৃঃ ৬৯।

Bibliography:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৩৩ বাংলা।
2. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, (সম্পাদনা), 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলি- ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮।
3. মজুমদার, ড. সমরেশ, 'গল্পগুচ্ছ:বিশ্লেষণী পাঠ', রত্নাবলী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।
4. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', (বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছর ১৮৯১-১৯৯০), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭৩ প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯ বাংলা।
5. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী, 'রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান', পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭ বাংলা।
6. রায়, নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৯ বাংলা।

CC BY NC